লোক প্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রধানত একটি দুর্যোগপূর্ণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, যেমন ঃ বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, কালবৈশাখী, পানিতে আর্সেনিকের প্রভাব প্রভৃতি প্রতি বছরই এই দেশটিকে আক্রান্ত করে। মানব-সৃষ্ট দুর্যোগসমূহও এদেশে কম ক্ষতিকারক নয়। যেমন ঃ পরিবেশদুষণ, বন-উজাড় তথা বৃক্ষ-নিধন, পয়ঃনিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি, পানি দুষিতকরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণপূর্বক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, যানবাহন দুর্ঘটনা প্রভৃতি মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ এদেশে অকালে কেড়ে নিচ্ছে বহু অমূল্য প্রাণ অথবা সৃষ্টি করছে নানা প্রকার মারণ-ব্যাধি।

এ সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে বন্যা নামক দুর্যোগটি এদেশে প্রতি বছরই প্রায় আঘাত হেনে চলেছে। এ বিষয়ে Alam (1990) বলেন যে, "...বার্ষিক বন্যা আক্রান্ত এলাকা সাধারণত ২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বন্যা বিপন্ন এলাকা এর চেয়েও বেশী, বিশেষজ্ঞবৃন্দ বাংলাদেশের ১,৪২,৭৭৭ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ৮২,০০৮ বর্গকিলোমিটার (৫৮%) এলাকাকে বন্যা বিপন্ন বলে গণ্য করে থাকেন। অপর এক হিসাব অনুসারে বলা হয় যে, উর্ধ্ব অঞ্চলের আকস্মাৎ নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের প্রায় ৮০% এলাকা প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। ১৯৫৪ সাল থেকে বিগত ৩৫ বছরে ২৮ বার এদেশে বন্যা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ১১ বার মারাত্মক বন্যা এবং ৫ বার সর্বাধিক মারাত্মক বন্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

বাংলাদেশে ২৩০টি প্রধান ও অপ্রধান নদ-নদী প্রায় ১৫,০০০ মাইল বিস্তৃত হয়ে দেশের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে (Islam, A. T. M.1985)। এর মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র -যমুনা ও সুরমা-মেঘনাকে প্রধান নদ-নদী হিসেবে গণ্য করা হয়। "১৯৮৮ সালের বন্যা স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহতম

* ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আকার ধারণ করেছিল। এই বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৩টি এবং ৪৬০টি থানার মধ্যে ৩২২টি কবলিত হয়েছিল"(Siddique, 1989)। দেশের প্রায় ৮২,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ও নিমজ্জিত হয়েছিল এবং ধরা হয়েছে যে, ৫০-১০০ বছর পরে এরূপ বন্যা সংঘটিত হয়েছে (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৮৮)। ৩,০০০ কিলোমিটার রাস্তা, ১৮০টি ব্রীজ ও কালভার্ট এবং ৬৪০ কিলোমিটার রেল লাইন হয় ভেসে গেছে, নয়তো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ২,৭০০ স্কুল-মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে ভেসে গেছে। বন্যা পরবর্তী পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ১৩,৪১৬ মিলিয়ন টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োজন ২২,৫২০ মিলিয়ন টাকা। সর্বমোট ৩৫,৯২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হিসাব করা হয় (টাস্ক ফোর্স, ১৯৮৮)।

বাংলাদেশের বন্যা এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর তীরবর্তী জেলাসমূহ প্রায় প্রতি বছরই বন্যা কবলিত হয়। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরকে বন্যাকালে আপন বাসগৃহ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী উঁচু এলাকা, গ্রাম, বাঁধ, স্কুল-কলেজ বা সরকারী দপ্তরসমূহের প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত এরূপ আশ্রয় গ্রহণের মেয়াদ ১ মাস স্থায়ী হয়। কোন কোন বছর তা ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময়ে তাঁরা তাঁদের অস্থাবর সম্পদের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। প্রায় খোলা আকাশের নিচে অথবা স্কুল-কলেজ বা সরকারী দপ্তরের একেকটি ঘরে বহু পরিবার একত্রে ঠাসাঠাসি করে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হন। প্রায় একই সময়ে বর্ষার কারণে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জীবন-যাপন আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য প্রস্তুত ও পানীয় জল সংগ্রহ তখন তীব্র সমস্যার রূপ ধারণ করে।

এ সময়ে বন্যা কবলিত আশ্রয় গ্রহণকারীদের কাজের ও রোজগারের সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠে। দরিদ্র পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যগণ কাজের খোঁজে দূর-দূরান্তে গমন করেন। কখনও বা তাঁরা শহর অভিমুখে অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে যান। আশ্রয়স্থলে অবস্থান করেন প্রধানত মহিলা ও শিশুগণ। বয়স্ক মহিলাগণ আশ্রয়স্থলের আশে পাশের বিত্তবান পরিবারে বিভিন্ন কাজ গ্রহণ করেন অথবা ধান ভানা, মুড়ি-চিঁড়া ভাজা, কাঁথা সেলাই, মাদুর বোনা ইত্যাদি কাজ গ্রহণ করেন। অবিবাহিতা ও যুবতী মহিলাদের পক্ষে আশ্রয়স্থলের বাইরে সহসা গমন সম্ভব হয়না বলে তাঁদের বলতে গেলে কোন পেশা বা উপার্জনই থাকেনা।

দরিদ্র পুরুষ সদস্যগণ কাজের অন্বেষণে দূরবর্তী স্থানে বা কোন শহরাঞ্চলে গমন করলে তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশুদের জীবনযাপন প্রক্রিয়া তথা আহার জোটানোর সমস্যা তীব্র হয়। অনেক সময় দূরগামী পুরুষ সদস্যগণের বহুদিন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়না অথবা তাঁরা আর ফিরেই আসেন না। এদিকে তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশুগণ বন্যা পরবর্তীকালে আপন বাস্তুভিটায় ফিরে গিয়ে পুনরায় ঘর নির্মাণসহ জীবন

যাপনের বন্দোবস্ত করতে অপারগ ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। বন্যার ফলে যদি তাদের আপন গ্রামটি বিলীন হয়ে যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থেই মহিলা ও শিশুগণ চিরতরে আশ্রয়হীন হয়ে যান। উভয় অবস্থাতেই মহিলা ও শিশুদেরকে 'বিপন্ন শ্রেণী' বা Vulnerable Group হিসেবে গণ্য করা যায়।

সাধারণ অবস্থায় এদেশের মহিলাদেরকে প্রধান দু'টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। (১) পরিবারের রান্না ও খাবারের সার্বিক আয়োজন; এবং (২) সন্তান লালন-পালন। বন্যার ফলে বিপন্ন মহিলাদেরকে আরেকটি নতুন দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো; পরিবারের শিশু সন্তানসহ অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য আয়-রোজগার করা। এই নতুন দায়িত্বটি পালনের ক্ষেত্র বাংলাদেশে মোটেও সুগম নয়। কারণ, এদেশে মহিলাদের রোজগারের ক্ষেত্রে ৪টি প্রধান সমস্যা বিদ্যমান। সেগুলো হলো ঃ

(১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে মহিলাদের গ্রহণযোগ্য পেশার পরিধি অত্যন্ত সীমিত।

(২) আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মূলত পুঁজি, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাব।

(৩) সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বল্প মজুরী

(৪) কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক অবমাননার আশঙ্কা।

এগুলোর বাইরে মহিলাদের রোজগারের ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা বিদ্যমান। যেমন ঃ দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে প্রসূতিকালীন কোন ছুটি বা মজুরী নেই, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘরে রেখে কর্মে যাওয়া সম্ভব নয়, আবার বার বার ঘরে ফিরে এসে সন্তানকে দুগ্ধদানের ছুটিও মালিক পক্ষ দিতে চায়না, সঙ্গে এরূপ সন্তান নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়াও অনেক মালিক সমর্থন করেনা, কর্মক্ষেত্রে শৌচাগারের অভাব, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালীন ছিনতাই, রাহাজানী, ধর্ষণের ভয় প্রভৃতি সমস্যাও মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমান।

তবু সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব এদেশে প্রধানত মহিলাদের উপর বর্তায় এবং দুর্যোগকালে মহিলাদের এটি অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যা পুরুষের উপর বর্তায়না। অথচ, দুর্যোগকালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির তালিকায় তাঁদের নাম থাকেনা, থাকলেও তা তালিকার সর্ব নিম্নে এবং প্রায়শ বিফল হয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। বন্যা পরবর্তীকালে প্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয় মহামারী, ডায়রিয়া প্রভৃতি অসুখ। এক্ষেত্রেও অসহায় শ্রেণী মহিলা ও শিশুগণ। বন্যাজনিত কারণে প্রতিবছর প্রধান প্রধান নদী তীরবর্তী এলাকায় মহিলা ও শিশুদের এরূপ চিত্র ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হয়। এরূপ অবস্থায়ও তাঁদেরকে বাঁচার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। আপন বাস্তুভিটায় এরা পরবাসী হয়ে জীবন কাটান। পুরুষ-প্রধান নিম্নবিত্ত

পরিবার এবং বিত্তবান (মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত) মহিলা-প্রধান পরিবারের মহিলা ও শিশুগণও নিরাপত্তাহীনতা, সহায়ক কাজের লোকের অভাব, চিত্ত বিনোদনের অভাব, যোগাযোগ ও চিকিৎসা সুযোগের অভাবে নিপতিত হন।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গ্রামীণ বাংলাদেশে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বন্যাজনিত বিপন্নতা একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এই গবেষণা কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। এর আলোকে বর্তমান গবেষণাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী সফল করার জন্য পরিচালিত হয়েছে ঃ

(১) প্রতি বছর বন্যায় আক্রান্ত এলাকার মহিলা ও শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা ও প্রকৃত পরিস্থিতি নির্ধারণ;

(২) বন্যাক্রান্ত হওয়ার পরে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতার (Vulnerability) স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ;

(৩) মহিলা ও শিশুগণ কর্তৃক বন্যাকালে ও বন্যা পরবর্তী পর্যায়ে জীবন যাপনের উপায় গ্রহণ ও অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার পদ্ধতি বিশ্লেষণ; এবং

(৪) বন্যাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের করণীয় ও পালনীয় কার্যক্রম এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে পন্থা নির্ধারণ।

গবেষণা পরিধি

এলাকাগত পরিধি হিসেবে প্রতিবছর বন্যাক্রান্ত সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ী সদর থানার যথাক্রমে খোকসাবাড়ী ও মিজানপুর নামক ইউনিয়নদ্বয়ের মধ্যে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমীক্ষাটির পরিধি নিম্নরূপ ঃ

- বন্যাক্রান্ত এলাকার বন্যা প্রবণতা, বন্যার কারণ ও স্থায়িত্ব এবং বন্যার ফলে এলাকার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ
- বন্যা-পূর্বকালীন গৃহীত সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বন্যার ক্ষয়-ক্ষতিরোধে গৃহীত সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থা, বন্যাকালীন ত্রাণ-তৎপরতা ও বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচি

- বাঁধের বাইরে ও ভিতরে বিভিন্ন বিত্তশ্রেণীর মহিলাদের বন্যাকালীন প্রতিক্রিয়া
- বন্যাক্রান্ত এলাকার জনগণের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বন্যাকালে আশ্রয়গহণ, খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, পেশা, আয় ও রোজগার, বন্যায় বসতবাটীসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি
- বন্যাকালে পুরুষ ও মহিলা প্রধান পরিবারের মহিলাদের সন্তান লালন-পালন, রান্না-বান্না ও সংসার পরিচালনার সমস্যাদি
- শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, চিত্তবিনোদন, শিশুশ্রম, চিকিৎসা ব্যবস্থা, টীকা/ইনজেকশান গ্রহণ
- বন্যা ও বন্যা-উত্তরকালে মহিলাদের গৃহীত ঋণের উৎস ও সুদের হার,বন্যার কারণে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়
- মহিলাদের অনুভূত সমস্যাদি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (পুরুষ-প্রধান ও মহিলা-প্রধান পরিবার)
- মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রীদের জীবনালেখ্য এবং মহিলা ও শিশুদের জীবন যাপনে বন্যার ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের দু'টি প্রধান নদী যমুনা ও গঙ্গার তীরবর্তী দু'টি জেলা, যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়ী বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর জেলা দু'টির ২৫-৪০ ভাগ এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ১৯৮৭ ও ৮৮ সালে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়েছিল। বন্যাক্রান্ততার প্রবণতা বিবেচনা করে এ দু'টি জেলার সদর থানার নদী তীরবর্তী দু'টি ইউনিয়ন, যথাক্রমে খোকসাবাড়ী ও মিজানপুরকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সংযুক্ত মানচিত্রে নমুনা এলাকা চিহ্নিত করা হলো।

নমুনা এলাকায় গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ম্যাপ অনুসরণ, পর্যবেক্ষণ, দাপ্তরিক নথিপত্র পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার ও কেইস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় নমুনা এলাকা থেকে পূর্ব-পরীক্ষীত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ২০০ পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পূর্ব-পরীক্ষীত গাইড লাইনের সাহায্যে ১০ জন মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রীর জীবনালেখ্য গ্রহণ এবং চেকলিষ্টের মাধ্যমে স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও প্রদত্ত

তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং থানা পর্যায়ে মহিলাবিষয়ক দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজ সেবা দপ্তর, যুব উন্নয়ন দপ্তর, থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-সমূহের দপ্তর থেকে তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে।

উভয় নমুনা ইউনিয়নের মধ্যে মাটি দ্বারা নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অবস্থিত। বাঁধের বাইরে বন্যার প্রকোপ অধিকতর এবং প্রতি বছরই আক্রান্ত হয় বলে নমুনা গ্রহণে শতকরা ৬০ ভাগ এবং বাঁধের ভিতরের অংশে শতকরা ৪০ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। শিশু হিসেবে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদেরকে গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সমীক্ষা এলাকার বৈশিষ্ট্য

বর্তমান সমীক্ষার জন্য বাংলাদেশের দু'টি প্রধান নদী যমুনা ও গঙ্গার কূলবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন এবং রাজবাড়ী জেলার সদর থানার মিজানপুর ইউনিয়নকে নমুনা এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নমুনা ইউনিয়দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে বর্ণনা করা হলো।

সিরাজগঞ্জ জেলার খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন

এই ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ সদরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ৩ কিলোমিটার দূর থেকে আরম্ভ হয়ে ৯ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে সদর থানার ছনগাছা ইউনিয়ন, পূর্বে যমুনা নদী, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এবং পশ্চিমে বাহুলি ইউনিয়ন অবস্থিত। খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ইছামতি নামক মরা নদী ইউনিয়নটিতে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমাগত উত্তরমুখী ভাবে প্রবাহিত হয়ে শৈলাবাড়ী গ্রামের নিকট বি,আ,ই বাঁধে সমাপ্ত হয়েছে। অনেকে একে চন্দ্রকোণা নদী বলে অভিহিত করেন। এটি যমুনার একটি উপনদী। এর একটি শাখা ছালামতি খাল নামে পরিচিত। যমুনার একটি ক্ষুদ্র শাখা 'দইভাঙ্গা' নদী নামে ছনগাছা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে খোকসাবাড়ীতে প্রবেশ করেছে। আর ৩টি মরা খাল ইউনিয়নটিতে বয়ে গেছে। সেগুলোর নাম বালিয়াজান, তেলকুপী ও কাটাখালী।

বাংলাদেশের বন্যার প্রকারভেদ মানচিত্রে সমীক্ষা এলাকা নির্দেশ

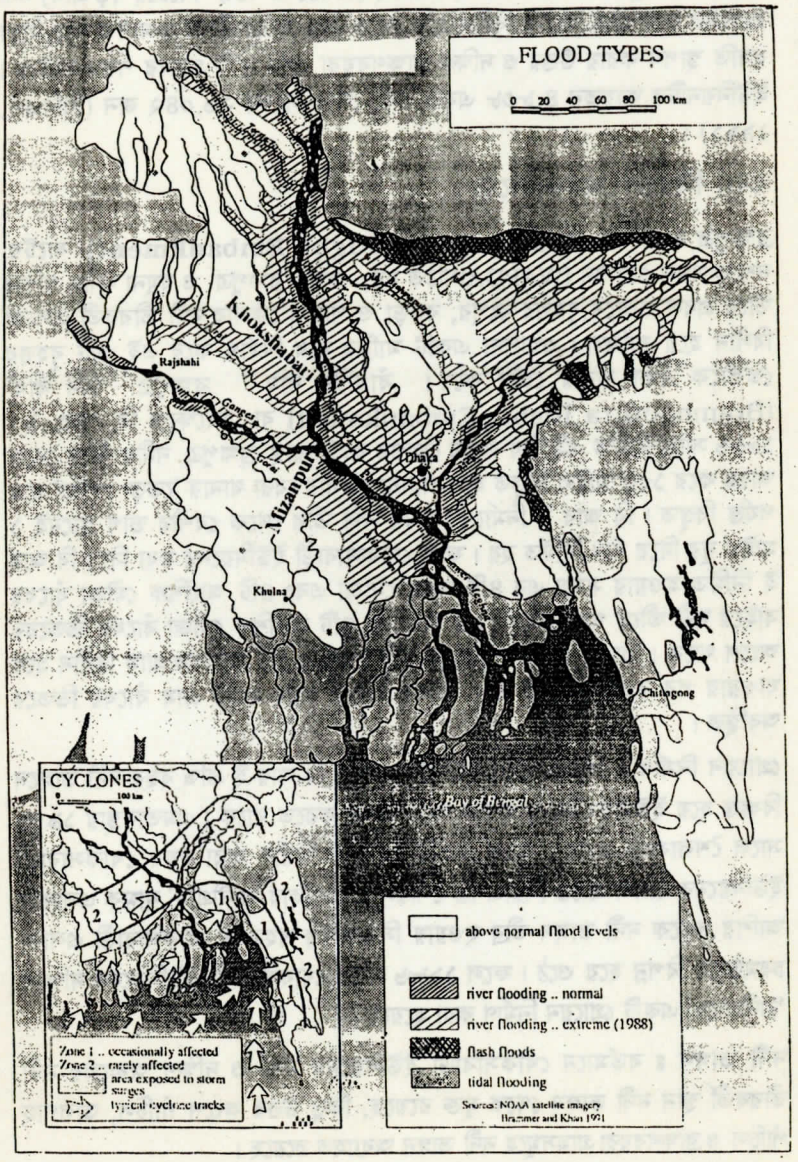

ইউনিয়নটিতে মোট ১৭টি মৌজা রয়েছে। ছোট বড় মিলে মোট ২৭টি গ্রাম বর্তমানে অবস্থিত। ইউনিয়নটিতে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে 'বেলতা' নামক একটি গ্রাম ছিল, যা যমুনার ভাঙ্গনে ১৯৬৮ সালে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণবয়রা' নামক উত্তর পূর্বাংশের একটি বিশাল গ্রাম (ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রাম) নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রায় অর্ধেক বিলীন হয়ে গেছে এবং অধিবাসীগণ ক্রমাগত সরে গিয়ে বসতি স্থাপন করায় উত্তর ও দক্ষিণ ব্রাহ্মণবয়রা নামে দু'টি গ্রামের পত্তন ঘটেছে। ইউনিয়নটির আয়তন ৪,৮৩৮ একর এবং লোক সংখ্যা ২৬,০৪২ জন (বিবিএস, ১৯৯১)।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো

ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধ **(Bramhaputra Right Embankment)**: ষাটের দশকে যখন ওয়াপদা (WAPDA)গঠিত হয়, তখন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে প্রবল ভাঙ্গনে বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার নদী তীরবর্তী এলাকা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ওয়াপদা একটি মাটির বাঁধ নির্মাণ করে এই ৩টি বৃহত্তর জেলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বাঁধটির নাম ' ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধ' (Bramhaputra Right Embankment) বা সংক্ষেপে বি, আর, ই। ১৯৬৬ সালে নির্মিত এই বাঁধ রংপুর জেলার কাউনিয়াস্থ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে থেকে আরম্ভ করে ১৩৫ মাইল বিস্তৃত হয়ে পাবনা জেলার বেরা থানার 'ভেড়া খোলা' গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বি আর ই নির্মাণের সময় নদী তীর থেকে বেশীর ভাগ স্থানেই ১ মাইল দূর দিয়ে বাঁধ নির্মিত হয়। ফলে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বি আর ই নির্মিত হওয়ার সময় এর ৪টি সমগ্র মৌজা এবং ৪টি আংশিক মৌজা বাঁধের বাইরে নদী তীরে পড়ে। বাকী ৯টি সমগ্র ও ৪টি আংশিক মৌজা বাঁধের ভিতরের অংশে থাকে। বাঁধের বাইরের অংশের ১টি সমগ্র ও ১টি আংশিক গ্রাম বিলীন হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে ৭টি গ্রাম বাঁধের বাইরে এবং ২০টি গ্রাম বাঁধের ভিতরে অবস্থিত।

গ্রোয়েন নির্মাণ ঃ খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন সংলগ্ন বি আর ই প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হয়ে ইউনিয়নটির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৭৯ সালে শৈলাবাড়ী গ্রামের কাছে একটি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়। খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এলাকার 'রানীগ্রাম' নামক এলাকায় আশির দশকে নদী ভাঙ্গন তীব্র হওয়ায় সিরাজগঞ্জ শহর ও খোকসাবাড়ী এলাকা চরমভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৮৬ সালে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণে 'রানীগ্রামে' একটি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন ঃ বর্তমানে খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের নদী তীরবর্তী স্থান নদী ভাঙ্গন থেকে মুক্ত রয়েছে, কিন্তু উত্তর অংশে পাঁচিল, তালগাছ পাঁচিল ও ব্রাহ্মণবয়রা গ্রামসমূহে নদী ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে।

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের অন্যান্য তথ্যাদি

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে মোট ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ইউনিয়নে ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা (৩টি ইবতেদায়ী, ২টি দাখিল, ১টি আলিম) এবং ৪২টি মসজিদ রয়েছে। জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ মুসলমান।

এনজিও কার্যক্রম ঃ খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক ও দ্বীপসেতু নামে ৪টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শাখা কার্যরত রয়েছে। এর মধ্যে 'দ্বীপসেতু' নামক এনজিওটি আঞ্চলিক, বাকীগুলো জাতীয়ভিত্তিক এনজিও।

সরকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে'র শাখা অফিস, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের শাখা অফিস এবং 'ভূমি-দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি' নামক একটি সরকারী প্রকল্প এই ইউনিয়নে কর্মরত আছে। শেষোক্ত প্রকল্পটি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের মোট ২০টি ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলায় কেবল খোকসাবাড়ী ইউনিয়নের পাঁচিল গ্রামে প্রকল্পটির ১টি শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষার হার ঃ ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ইউনিয়নে শিক্ষার হার জাতীয় হারের (৩২.৪) চেয়ে কম, শতকরা ২৫.৭ ভাগ। এর মধ্যে পুরুষ শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ১৯.৫ ভাগ। শিক্ষিতদের অধিকাংশেরই (শতকরা ৭৬ ভাগ) শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পর্যায়ের। ১৯৯১ সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নমুনা পরিবারসমূহের বর্তমান শিক্ষার হার ৬৯%।

পেশা ঃ এই ইউনিয়নের পুরুষদের অধিকাংশের প্রধান পেশা কৃষি। এছাড়া দিন মজুর, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার লোকও রয়েছে। এই ইউনিয়নে কোন তাঁত নেই। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে (বাগবাটী ও বাহুলী) তাঁতের কাজ চলে। এই ইউনিয়নের কিছু লোক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে তাঁতের কাজ করেন। নদী তীরবর্তী এলাকা হলেও জেলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পুরুষদের অপ্রধান পেশার মধ্যে ব্যবসা, নৌকা চালানো, কৃষি, রিক্সা/ভ্যান চালানো, বন্যাকালে মাছ ধরা এবং দালালী (টাকার বিনিময়ে অন্য লোককে কোন কিছু ক্রয়ে বা কোন কাজ করতে সহায়তা করা) পেশা উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের গৃহকর্মই প্রধান পেশা, কিছু শ্রমজীবী ও দিন মজুর রয়েছে। তাদের অপ্রধান পেশার মধ্যে শাক-সব্জী চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, তাঁতের কাজ (মূলত সূতো কাটা ও রং করা) কাঁথা সেলাই এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা উল্লেখযোগ্য।

মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম ঃ এই ইউনিয়নে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সমিতি গঠনপূর্বক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ এবং আয় বর্ধনমূলক কাজে

অনেকেই নিয়োজিত। সরকারী সংস্থা পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের 'মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি' (এম, বি, এস, এস) ১৭টি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৪২৫ জন। এরা সবাই গড়ে ৪,০০০ টাকা করে ঋণ গ্রহণ করেছেন (সূত্রঃ বিআরডিবি, সিরাজগঞ্জ সদর থানা শাখা দপ্তর)। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ৪০০টি সদস্য পরিবার এই ইউনিয়নে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা (সূত্রঃ গ্রামীণ ব্যাংক, শাহানগাছা শাখা দপ্তর)। প্রশিকা নামক এনজিও'র ১০০টি গ্রুপ উক্ত ইউনিয়নে ঋণ সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ ও সাহায্য পেয়ে থাকে। এর প্রতিটি গ্রুপেই সর্বোচ্চ ২৫ জন করে মহিলা সদস্য রয়েছেন (সূত্রঃ প্রশিকা, কাজীপুর রোড, সিরাজগঞ্জ শাখা দপ্তর)। ব্র্যাকের মোট ১৪টি সমিতিতে ৭০৫ জন সদস্য রয়েছেন এই ইউনিয়নে, এর মধ্যে ২৮৩ জন মহিলা সদস্য। এঁরা সকলেই আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ পেয়ে থাকেন।

খোকসাবাড়ী ইউনিয়নে বন্যার তীব্রতা, ১৯৯২-১৯৯৬

বিগত ৫ বছরের বন্যার তীব্রতা সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রতিবছরই ব্রহ্মপুত্র ডান বাঁধের বাইরের অংশ প্লাবিত হয়েছে এবং বন্যার পানি বাঁধে এসে আঘাত হেনেছে। বাঁধের বাইরের অংশের মধ্যে গ্রোয়েন এলাকায় সামান্য কিছু পরিবারের বাড়ীতে পানি ওঠেনি। বাকি সকল পরিবারের আঙ্গিনায় পানি ছিল। ১৯৯৫ ও ৯৬ সালে পূর্বের ৩ বছরের তুলনায় বন্যার মাত্রা তীব্র ছিল। ঘরের ভিতরে ১-২ ফুট পানি প্রবেশ করেছিল।

বাঁধের ভিতরের অংশে ২টি মরানদী ও ৪টি খাল থাকায় সে অংশেও বন্যা হয়েছে প্রতি বছর। কিন্তু বন্যার পানি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেনি। প্রায় ৫০ ভাগ রাস্তাঘাটে পানি উঠেছিল ১৯৯৫ ও ৯৬ সালে। ১৯৯৩, ৯৫ ও ৯৬ সালে বন্যা মে মাসের শেষ দিকে আঘাত হানার ফলে বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসল প্রায় অর্ধেক বা তার বেশী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, যমুনা নদীতে সাধারণত দু'বার বন্যা দেখা দেয়। প্রথমবার জুন মাসে, দ্বিতীয় বার জুলাই মাসের শেষে বা আগষ্ট মাসে।

রাজবাড়ী জেলার মিজানপুর ইউনিয়ন

রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর থানার মিজানপুর ইউনিয়নটি রাজবাড়ী পৌরসভার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ২ কিলোমিটার দূর থেকে ১০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি বিরাট ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা নদী, পূর্ব প্রান্তে যমুনা নদী, দক্ষিণে রাজবাড়ী পৌরসভা এলাকা ও দাদশী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের আয়তন ১২,৪১২ একর (তবে নদী ভাঙ্গনের ফলে বর্তমানে আয়তন ৯,৪৬৮ একর) এবং মৌজা সংখ্যা ৩৮টি। মোট গ্রামের সংখ্যা বর্তমানে ৩৬টি। ইউনিয়নটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৪ কিলোমিটার লম্বা। ইউনিয়নের উত্তর পূর্ব প্রান্তে 'বেতকা' নামক গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে গঙ্গা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া 'মৌকুড়ি' এবং 'বহড়া কাঠুরিয়া' গ্রামের অর্ধাংশ নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে। মিজানপুর ইউনিয়নের 'বেনীনগর' নামক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামটির

নিকট থেকে গঙ্গা নদীর একটি শাখা ইউনিয়নিটিতে প্রবেশ করে ইউনিয়নের মধ্যখান দিয়ে 'মরাপদ্মা' নামে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে যমুনা নদীতে দৌলতদিয়া ঘাটের নিকট পতিত হয়েছে। বন্যাকালে গঙ্গা এবং মরাপদ্মা এই দুই নদীর প্লাবনে মিজানপুর ইউনিয়নের দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়ে থাকে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ইউনিয়নের পরিবার সংখ্যা ৫,৭৮৬টি এবং লোকসংখ্যা ৩১,৫৭৮জন। কিন্তু ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী পরিবার সংখ্যা ৬,৯১০টি এবং লোক সংখ্যা ৪০,১২৪জন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো

১৯৮৭ সালের বন্যার পর ডাচ ও সুইডিস সরকারের অর্থায়নে 'ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্প' নামে একটি গঙ্গা নদী তীরবর্তী মাটির বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ আরম্ভ করা হয়। বাঁধটি 'ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্প' হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এর কাজ আরম্ভ হয় কুষ্টিয়ার বিখ্যাত 'শিলাইদহ' থেকে এবং ফরিদপুর পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার বাঁধের কাজ ১৯৯০ সালে শেষ হয়। এটি প্রথম পর্যায়ে মাদারীপুর পর্যন্ত যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে ফরিদপুর থেকে আরও ৮৯ কিলোমিটার নির্মাণ করা হবে। শিলাইদহ থেকে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে নির্মিত এই বাঁধ মিজানপুর ইউনিয়নে এসে গঙ্গা ও মরাপদ্মা এই দুই নদীকে উত্তরে রেখে গোয়ালন্দ অভিমুখে নির্মিত হয়েছে। ফলে গঙ্গা ও মরাপদ্মা নদীর বন্যা একযোগে এই বাঁধে আঘাত হানে প্রতিবছর এবং বাঁধের বাইরের এলাকা প্লাবিত হয়। বর্তমানে রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বাঁধের উপরে পাকা রাস্তা নির্মিত হচ্ছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বাইরে এই ইউনিয়নের ১৭টি পূর্ণ মৌজা এবং ৫টি আংশিক মৌজা এবং বাঁধের ভিতরে ১৬টি পূর্ণ মৌজা ও ৫টি আংশিক মৌজা অবস্থিত। তবে বাঁধ নির্মাণের পরে বাঁধের বাইরের সঙ্গতিপূর্ণ বহু পরিবার বাঁধের ভিতরের অংশে জমি কিনে বাড়ী তৈরি করায় বাঁধের বাইরের এলাকায় পরিবার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বাঁধের বাইরে শতকরা ৮০ ভাগ নিম্নবিত্ত, ১৭ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং মাত্র ৩ ভাগ উচ্চবিত্ত সম্পন্ন পরিবার বর্তমানে অবস্থান করছে। উচ্চবিত্ত (৩%) দের অনেকেরই রাজবাড়ী শহরে বা বাঁধের ভিতরের অংশে আরেকটি করে বাড়ী রয়েছে। বন্যাকালে তারা সে সব বাড়ীতে ২/৩ মাসের জন্য বসবাস করে থাকে।

মিজানপুর ইউনিয়নের অন্যান্য তথ্যাদি

মিজানপুর ইউনিয়নে ৭টি সরকারী এবং ৫টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বাঁধের বাইরের এলাকায় ২টি সরকারী ও ১টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বাকীগুলো বাঁধের ভিতরের অংশে অবস্থিত। ২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসা (১টি ইবতেদায়ী ও ১টি আলিম মাদ্রাসা) বাঁধের ভিতরের অংশে অবস্থিত।

মোট ২৪টি মসজিদ ও ২টি মন্দির রয়েছে ইউনিয়নটিতে। কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এনজিও কার্যক্রম ঃ এই ইউনিয়নে এনজিও কার্যক্রম তেমন একটা জোরদার নয়। ব্র্যাক ও কারিতাস ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের শাখা নেই এখানে। ব্র্যাক পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৪টি সমিতি গঠন করে তাঁদেরকে ঋণ প্রদান পূর্বক আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে বাঁধের বাইরের অংশে মাত্র ৩টি সমিতি রয়েছে। কারিতাস কোন প্রকার ঋণ বিতরণ করেনা। তবে প্রতি বছর বন্যায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সাহায্য প্রদান করে থাকে। ১৯৯৫ সালে কারিতাস ৩০০টি দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল ও ১কেজি করে লবণ দান করেছিল। বন্যার পরে ১০০টি পরিবারকে ১টি করে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। এর উপকরণ হলো ঃ ২ বান্ডিল টিন, ৪টি লোহার এ্যাঙ্গেল, ৬টি আরসিসি পিলার, ৩টি বাঁশের খুটি, মুলিবাঁশের বেড়া ৪টি এবং তৈরির জন্য ৪০০ করে টাকা।

সরকারী প্রতিষ্ঠান ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তরের রাজবাড়ী থানা শাখা এ যাবত ৩৬০জনকে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ১,৪৪,০০০ টাকা এবং ২৭০ জনকে সামাজিক বনায়নের জন্য ৫টি করে গাছের চারা দান করেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ১৯টি বিত্তহীন সমবায় সমিতি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৩৭৫জন। এদের মধ্যে ফসলী কর্জ হিসেবে ৪,৬৯,৮০০ টাকা এবং মেয়াদী কর্জ হিসেবে ৪,৭২,৩২৯ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র কোন মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এম, বি, এস, এস) এই ইউনিয়নে এখনও গঠন করা হয়নি। থানা মহিলাবিষয়ক দপ্তর থেকে ৫১ জন দুঃস্থ মহিলাকে ১,১৪,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে (সূত্রঃ থানা সমাজ সেবা, বিআরডিবি ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর, রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭)।

শিক্ষার হার ঃ মিজানপুর ইউনিয়নে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ১৯৯১ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী শিক্ষার হার শতকরা ২০.৮ ভাগ। এর মধ্যে মহিলা শিক্ষার হার শতকরা ১৪.৮ এবং পুরুষ শিক্ষার হার শতকরা ২৬.৮ ভাগ। বাঁধের বাইরের অংশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, তবে তার সঠিক সংখ্যা কোথাও পাওয়া যায়নি। ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নমুনা পরিবারসমূহের শিক্ষার হার বর্তমানে ৫০%।

পেশা ঃ মিজানপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ পুরুষের প্রধান পেশা কৃষি। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের পেশা দিনমজুরী, ব্যবসা, মেকানিক্স, রিক্সা ও ভ্যান চালানো। পুরুষদের অপ্রধান পেশার মধ্যে মাছ ধরা, ব্যবসা, দিনমজুরী, মহাজনী ও মজুতদারী। বাঁধের বাইরের অংশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। বন্যাকালে দ্বিগুণ মূল্যে শস্যাদি বিক্রির জন্য সম্পদশালীরা মজুতদারী পেশায় নিয়োজিত থাকেন। মহিলাদের প্রধান পেশা গৃহকর্ম, দরিদ্র মহিলাদের প্রধান পেশা দিনমজুরী ও ঝি-গিরি। অপ্রধান

পেশার মধ্যে কৃষিকার্যে সহায়তা, হাঁস-মুরগী পালন, কাঁথা সেলাই, ধানভানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম ঃ মিজানপুরে মহিলাদের সমিতি কার্যক্রম অত্যন্ত স্বল্প। শিক্ষার স্বল্প হার ছাড়াও ধর্মীয় কুসংস্কার এখানে বেশী। তাই এনজিও কার্যক্রমে সমিতি গঠন করে ঋণ গ্রহণপূর্বক আয় বর্ধনমূলক কাজে মহিলাদের মোটেও আগ্রহ নেই। তাঁরা মনে করেন, ঋণ গ্রহণ করলে তাঁদের ভিটে-মাটি নিলাম হয়ে যাবে। তাছাড়া, সমিতি করে সদর থেকে টাকা আনা-নেওয়া বা পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা ও যাতায়াতকে তাঁরা ধর্মীয়ভাবে খারাপ কাজ বলে মনে করেন। বাঁধের বাইরের অংশে কোন মহিলা সমিতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। বাঁধের বাইরের অংশে চর এলাকায় 'সর্বহারা' পার্টির আনাগোনা রয়েছে। সে কারণে কোন এনজিও এই এলাকায় সমিতি গঠন বা কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী হয়না।

মিজানপুর এলাকায় বন্যার তীব্রতা, ১৯৯২-৯৬

১৯৯২ ও ৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে বন্যার মাত্রা কিছুটা বেশী ছিল। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বন্যার মাত্রা ছিল প্রবল। বাঁধের বাইরের অংশে প্রতিবছরই বন্যা হয়। রাস্তাঘাট সব তলিয়ে যায়। বাড়ীর উঠোনে পানি জমে, তবে বাড়ীর মধ্যে পানি সব স্থানে ওঠেনি। এর মধ্যে গঙ্গা নদীর পাড়ের এলাকায় বাড়ী ঘরে পানি ওঠে না, কিন্তু মরাপদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়ের এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বাড়ী ঘরে পানি ওঠে। বাঁধের বাইরের অংশের প্রায় সর্বত্রই অন্য বাড়ী যেতেও নৌকা বা ভেলা ব্যবহার করতে হয়। প্রতি বছরই গঙ্গা নদীর পাড়ে বন্যাকালে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। বিগত ৫ বছরে মিজানপুর এলাকার বাঁধের ভিতরের অংশে কোন বন্যা হয়নি। ১৯৯৫ সালে অতি বর্ষণজনিত কারণে কিছুটা জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তাঘাটে কয়েকদিন পানি জমে ছিল, আর কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

বন্যা ও বিপন্নতা

বন্যার ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

নমুনা এলাকায় ১৯৯২-৯৩ সালে বন্যা তেমন একটা প্রকট ছিল না। ১৯৯৪ সালে মিজানপুরে এবং ১৯৯৫ সালে উভয় এলাকায় বন্যার তীব্রতা যথেষ্ট বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালের বন্যার মাত্রা ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় উভয় এলাকায় বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালে খোকসাবাড়ীতে বাঁধের বাইরের অংশে মিজানপুরের বাঁধের বাইরের অংশের তুলনায় বন্যার মাত্রা বেশী ছিল। ১৯৯৬ সালের বন্যায় শতকরা ৫৩ ভাগ পরিবারের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগের ফসল এবং শতকরা ৭৩ ভাগের ফলজ বৃক্ষাদি আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০০ পরিবারের মোট ৩৮৮টি ঘরের ক্ষতিগ্রস্ততার বিবরণ সারণী-১ এ দেখানো হলো।

সারণী ঃ ১

নমুনা এলাকাদ্বয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের বর্ণনা ও সংখ্যা, ১৯৯৬

ক্ষতিগ্রস্ততার বর্ণনা	খোকসাবাড়ী (N=১৫৫)				মিজানপুর (N=২৩৩)				সর্বমোট (N=৩৮৮)	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	মোট	শতকরা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	মোট	শতকরা		
আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত	২৭	৫৪	৮১	৫২.২৬	৭	২৫	৩২	১৩.৭৩	১১৩	২৯.১২
সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত	১৬	৩৭	৫৩	৩৪.১৯	৬	৩৫	৪১	১৭.৬০	৯৪	২৪.২৩
ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি	২১	–	২১	১৩.৫৫	৮৫	৭৫	১৬০	৬৮.৬৭	১৮১	৪৬.৬৫
মোট ঘর	৬৪	৯১	১৫৫	১০০.০০	৯৮	১৩৫	২৩৩	১০০.০০	৩৮৮	১০০.০০
শতকরা			৩৯.৯৫				৬০.০৫		১০০.০০	

(বাঁ-ভি=বাঁধের ভিতরে, বাঁ-বা=বাঁধের বাইরে)

বন্যার ফলে অভিগমন

বিগত ৫০ বছরে উভয় এলাকার নমুনা পরিবারে মধ্যে খোকসাবাড়ীর ৮৪টি এবং মিজানপুরের ৭৪টি পরিবার, মোট ১৫৮টি পরিবার বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণে বাড়ী ঘর স্থানান্তরিত করেছেন এবং উভয় এলাকার মোট ২৭টি পরিবার বাঁধের বাইরে থেকে ভিতরের অংশে চলে এসে বাড়ী ঘর নির্মাণ করেছেন। উভয় এলাকার ১০টি পরিবারে মোট ১২জন সদস্য অন্যত্র অভিগমন করেছেন (সারণী-২)।

সারণী ঃ ২

বন্যার কারণে বিগত ৫০ বছরে গৃহ স্থানান্তরিত করার সংখ্যা / বার (N=২০০)

গৃহ স্থানান্তর সংখ্যা	নমুনা এলাকা				সর্বমোট	শতকরা	বাঁধের বাইরের এলাকা থেকে বাঁধের ভিতরের এলাকায় চলে আসা পরিবার সংখ্যা
	খোকসাবাড়ী		মিজানপুর				
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			
১ বার	১০	২২	১১	১৬	৫৯	২৪.৫	১৩
২ বার	৭	৮	৩	৯	২৭	১৩.৫	৬
৩ বার	২	১১	২	৫	২০	১০.০	৩
৪ বার	১	৪	২	৪	১১	৫.৫	১
৫ বার	৩	২	১	৩	৯	৪.৫	২
৬ বার	২	৩	১	২	৮	৪.০	১
৭ বার	২	১	১	১	৫	২.৫	১
৮ বার	–	২	–	১	৩	১.৫	
৯ বার	–	১	–	৫	৬	৩.০	
১০ বার	–	৩	–	২	৫	২.৫	
১১ বার	–	–	–	১	১	০.৫	
১২ বার	–	–	–	১	১	০.৫	
১৩ ও তদূর্ধ্ব বার	–	–	–	৩	৩	১.৫	
স্থানান্তরিত করেনি	১৩	৩	১৯	৭	৪২	২১.০	
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০	২৭টি পরিবার

বিঃ দ্রঃ খোকসাবাড়ীর বাঁধের বাইরের এলাকার ৬টি পরিবার ও মিজানপুরের ৪টি পরিবার, মোট ১০টি পরিবার থেকে ১২ জন সদস্য বাঁধের ভিতরের এলাকায় বা অন্যত্র (শহরে) অভিগমন করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

উভয় এলাকার ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃ কল্যাণকেন্দ্র বাঁধের ভিতরের এলাকায় অবস্থিত। বন্যাকালে সেখানেও ওষুধ সরবরাহ থাকে না। ডাক্তার ডেকে বাড়ীতে আনার সম্মানী/ফি প্রায় ২/৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশীর ভাগ পরিবার চিকিৎসার প্রয়োজনে নৌকা বা ভেলায় রোগীকে নিয়ে জেলা/থানা সদর হাসপাতালে অথবা বেসরকারী ডাক্তারের চেম্বারে যান। বন্যাকালে চিকিৎসা ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মহিলাদেরকে প্রায় সারাদিন সংসারের কাজে ভেজা কাপড়েই থাকতে হয়। এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই, অথচ তাঁরা খুব কমই চিকিৎসা সুযোগ পান।

আইন শৃংখলা ব্যবস্থা

বন্যাকালে খোকসাবাড়ী এলাকায় চুরি বেড়ে যায়, ডাকাতি তেমন একটি বাড়ে না। কিন্তু মিজানপুরে চুরি এবং জলদস্যু কর্তৃক ডাকাতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায়। চুরির জন্য স্থানীয় লোকদেরকে দায়ী করা হয়ে থাকে, তবে ডাকাতি বা জলদস্যুতার ক্ষেত্রে অন্য এলাকার (সাধারণত নদী পারের চর এলাকার) লোকদেরকে দায়ী করা হয়। রাহাজানি (হাইজ্যাক) কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তবে ধর্ষণ খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। পুরুষ-প্রধান পরিবারের তুলনায় মহিলা-প্রধান পরিবারে এসব সমস্যা বেশী হয় না বলে জানা গেছে। কিন্তু মহিলাবৃন্দ বন্যা বেশী হলেও নিজেদের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে রাজী থাকেন না। এক্ষেত্রে দু'একজন স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, অন্যত্র আশ্রয় নিলে ধর্ষণের ভয় বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে, যার তথ্য পাওয়া আমাদের সমাজে খুবই কঠিন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৯৯৬ সালে সরকারী ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ পরিবার। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে চালই প্রধান। শতকরা ৪৪ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সরকারী ত্রাণ সামগ্রীর মূল্য ৪১-৫০ টাকা। বেসরকারী ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন মাত্র ৩টি পরিবার, যার মূল্য দু'টি ক্ষেত্রে ১১-৩০ টাকা এবং ১টি ক্ষেত্রে ১২১ টাকার কিছু বেশী। পুনর্বাসন সামগ্রী হিসেবে সরকারী সাহায্য পেয়েছেন মোট ২৬টি পরিবার এবং এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য ৩১-৬০ টাকার মধ্যে। পুনর্বাসন সামগ্রীর মধ্যে চাল এবং বীজ ও সার অন্যতম। বেসরকারী পুনর্বাসন সামগ্রী হিসেবে মিজানপুর এলাকার ৩টি নমুনা পরিবার 'কারিতাস' নামক এনজিও'র নিকট থেকে ৩টি টিনের ঘর পেয়েছেন, যেগুলোর মূল্য ৫,০০০-৭,০০০ টাকার মধ্যে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রী বিতরণ অনিয়মিত, বিলম্বিত এবং খুবই অপ্রতুল।

বন্যার কারণে পেশা পরিবর্তন

১৯৯৬ সালের বন্যাকালে শতকরা ৭০ ভাগ অধিবাসীর প্রধান পেশা বন্ধ ছিল। যে ৩০ ভাগ অধিবাসী তাঁদের নিজেদের পেশা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের

অধিকাংশই (২৭%) বাঁধের ভিতরের অংশের অধিবাসী। বাঁধের বাইরে মাত্র ৩ ভাগ তাঁদের প্রধান পেশা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীরই প্রধান পেশা বন্যাকালে বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। ফলে তাঁদেরকে সাময়িকভাবে অপ্রধান পেশা গ্রহণ করতে হয়। অপ্রধান পেশার ক্ষেত্রে দু'টি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। যেমন, কিছু বিত্তবান ব্যক্তি, তাঁরা বন্যার পূর্বে স্বল্প মূল্যে ফসল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশী করে কিনে মজুত করে রাখেন। বন্যা ও বন্যার অব্যবহিত পর পর্যন্ত অসহায় ও পানিবন্দী পরিবারগুলো এঁদের নিকট খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যন্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য হন। এ সময়ে ঐ সব মজুতদার দৈনিক ১৫০০-২০০০ টাকা লাভ করে থাকেন। কেউ কেউ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে দরিদ্রদের অসহায়ত্বকে আরও তীব্রতর করে তুলেন। এঁরাও দৈনিক ১০০০-১৫০০ টাকা মুনাফা/সুদ (গড়ে) পেয়ে থাকেন। আর নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রধান পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা কৃষি কাজ বা দিনমজুরীর পরিবর্তে মাছ ধরা, নৌকা চালানো, মুটেগিরি এবং ভিক্ষা করা পেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত-মজুর বা মিলের শ্রমিক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঝি-গিরি, কাঁথা সেলাই করা, ভিক্ষা করা প্রভৃতি অপ্রধান পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হন। এঁদের প্রধান পেশায় ফিরে আসতে গড়ে ২৭দিন সময় বিলম্ব হয়েছিল। পেশা পরিবর্তন কেবল আয়ই কমায় না, তাঁদের নতুন ও কষ্টকর পেশা চালনা করতে বাধ্য করে। নৌকা চালানো দিন মজুরীর তুলনায় কষ্টকর কাজ এবং ভিক্ষা করা ক্ষেতমজুরীর তুলনায় নিকৃষ্টতর পেশা (সারণী-৩)।

সারণী ঃ ৩

বন্যার পরে পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রধান পেশা আরম্ভকরণে বিলম্ব কাল, ১৯৯৬

প্রধান পেশা আরম্ভকরণে বিলম্ব কাল (দিনে)	নমুনা এলাকা				সর্বমোট (N=২০০)	শতকরা
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মিজানপুর (N=১০০)			
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
কোন বিলম্ব হয়নি, সর্বদাই পেশা চালু ছিল	২২	৪	৩২	২	৬০	৩০.০
অনূর্ধ্ব১৫ দিন	৮	৬	৪	১২	৩০	১৫.০
১৬-৩০ দিন	১০	২১	৪	২৫	৬০	৩০.০
৩১-৪৫ দিন	–	১৯	–	১৭	৩৬	১৮.০
৪৬-৬০ দিন	–	১০	–	৪	১৪	৭.০
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০

বন্যার কারণে সম্পদ বিক্রি, ঋণ ও বিপন্নতা

বন্যার কারণে নমুনা এলাকার শতকরা ৪৯ ভাগ পরিবার কর্জ (ধার, যা বিনাসুদে গ্রহণ করে) ও ঋণ (যা সুদের বিনিময়ে গ্রহণ করে) গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩১.৫% ভাগ আত্মীয়/প্রতিবেশীদের নিকট কর্জ এবং ১৭.৫ ভাগ সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সুদের হার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১০০ টাকায় মাসে ১০ টাকা। তবে কিছু পরিবারকে ১০০ টাকায় মাসে ৩০ টাকা হারেও সুদ দিতে হয়। অর্থাৎ বন্যায় যদি ৪ মাস এঁরা কাজ না পান, তাহলে মহাজনকে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দিতে হবে। ফলে নিঃস্বতার একটি পথ এভাবেই তৈরি হচ্ছে। আরেকটি দিক উল্লেখযোগ্য, অধিবাসীগণ বন্যার কারণে অনেক সময় আধা পাকা ফসল কাটতে বাধ্য হন এবং তার বিক্রি মূল্যও প্রায় অর্ধেক পেয়ে থাকেন। বন্যা এলে রাখার স্থানের অভাবে ফসল, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী বিক্রি করেন জলের দামে। ঠেকায় পড়ে ফসল কম দামে বিক্রি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে ঘর মেরামত বা তৈরির জন্যও বিক্রি করতে হয় স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পদ। নমুনা এলাকায় বন্যা কালে শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ বিক্রি করতে হয়েছে গড়ে অন্য সময়ের চেয়ে শতকরা ২৬ ভাগ কম দামে। এর ফলে নিঃস্ব ও বিপন্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন এসব অধিবাসী (সারণী-৪)।

সারণী ঃ ৪

বন্যা-পরবর্তী কালে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়, ১৯৯৬

স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রির কারণ	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী (N -১০০)		মোট	শতকরা	মিজানপুর (N -১০০)		মোট	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
অভাবে/সংসার পরিচালনার জন্য	১	৭	৮	৮.০	৭	১৩	২০	২০.০
ঘর তৈরি করতে	১	–	১	১.০	২	৭	৯	৯.০
ফসলের বীজ ক্রয় কারতে	–	–	–	–	–	২	২	২.০
কোন কিছু বিক্রি করেনি	৩৮	৫৩	৯১	৯১.০	৩১	৩৮	৬৯	৬৯.০
মোট	৪০	৬০	১০০	১০০.০	৪০	৬০	১০০	১০০.০

বন্যা ও মহিলাদের বিপন্নতা

বন্যাকালে ও বন্যার অব্যবহিত পরে পরিবারের মহিলা সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। বন্যাকালে সাধারণত মাচার বা চৌকির (তক্তপোষ) উপর মাটির বা টিনের চুলো বানিয়ে নমুনা এলাকার অধিবাসীবৃন্দ রান্না-বান্না ও আহারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৬ সালে বন্যা তেমন প্রবল না হওয়ায় শতকরা ৪৪ ভাগের রান্না-বান্না স্বাভাবিকভাবে রান্নাঘরে বা চুলোয় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই ৪৪% এর মধ্যে ৩৩% বাঁধের ভিতরের এলাকার অধিবাসী। যাঁরা বাঁধের বাইরের অংশে বাস করেন, এরূপ পরিবারকে মাচার উপর চুলো বসিয়ে রান্না করতে হয়েছে। এদের সংখ্যা ৫৬%। আটা বা ময়দা গুলে খেতে হয়েছে ৫টি পরিবারকে প্রায় ৭ দিন। কেউ কেউ অন্যের বাড়ী থেকেও রান্না করে নিয়ে এসেছেন। অনেকে অনাহারে থাকেন। অথচ দরিদ্র ও মহিলা-প্রধান পরিবার প্রতিবছর খোকসাবাড়ীতে গড়ে ৫ কেজি চাল এবং মিজানপুরে ১০/১২ কেজি গমের বেশী ত্রাণ/সাহায্য পান না। কেইস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত মহিলা-প্রধান পরিবারের তথ্যে জানা গেছে যে, বন্যাকাল আসলেই ১২/১৩ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের ভাবনা মহিলাদেরকে বেশী পীড়িত করে। কারণ তাতে একজনের আহার জোটাবার কষ্ট কমে যেতো এবং সম্ভ্রম রক্ষার দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম নষ্ট হতো না। এঁদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার/হাট থেকে এনে দেবার তেমন কেউ থাকেন না। চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রতিবেশীদেরকে অনুরোধ জানাতে হয়। অসুস্থ স্বজনকে দেখতে যেতে পারেন না। দূর থেকে পানীয় জল আনতে ভেলায় চড়ে যেতে হয়। যদি কারুর ভেলা না পাওয়া যায়, তাহলে বন্যার পানিই পান করতে বাধ্য হন।

পুরুষ-প্রধান পরিবারের মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যা

মহিলাদেরকেই বাংলাদেশে গৃহের যাবতীয় কর্মের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। বন্যাকালে তাঁদের বহুমুখী সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, খড়ির অভাবে রান্না করার অসুবিধা, মাচার উপরে রান্না করার কষ্ট, দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসার কষ্ট, সন্তান পালন, বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী সন্তানদেরকে পানিতে পড়ে যাবার ভয়ে সর্বক্ষণ আগলে রাখা, রোগী, প্রসূতি মাতা ও মেহমানদের সেবা করার ক্ষেত্রে সমস্যা, একই ঘরে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও গবাদি পশু নিয়ে বাস করা, চোর/ডাকাতের ভয়ে এবং ছোট শিশুর পানিতে পড়ে যাবার উদ্বেগে রাতে জেগে থাকা, হাঁস/মুরগী ও গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলোর আহার জোগানো প্রায় সারাদিন ভেজা কাপড়ে অবস্থান করার ফলে শারীরিক অবসাদ ও অসুখ সৃষ্টি, ধান থেকে চাল ও আটা তৈরির সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় মহিলাদেরকে (সারণী-৫)।

সারণী ঃ ৫

বন্যাকালে গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে মহিলাদের সমস্যা, ১৯৯৬

গৃহস্থালী কাজে মহিলাদের সমস্যা	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মোট	শতকরা	মিজানপুর (N=১০০)		মোট	শতকরা
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা			বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
ধান থেকে চাল/আটা তৈরির অসুবিধা	৭	১৭	২৪	২৪.০	৬	১৯	২৫	২৫.০
বাড়ী-ঘর উঠোন পরিষ্কার করার সমস্যা	৮	১৪	২২	২২.০	৭	৮	১৫	১৫.০
ঘুঁটে তৈরি ও শুকানোর সমস্যা	৩	৬	৯	৯.০	৪	৮	১২	১২.০
পায়খানা/প্রস্রাবখানার সমস্যা	৩	৫	৮	৮.০	২	৫	৭	৭.০
কাপড়-চোপড় সিদ্ধ করে কাচার সমস্যা	–	৩	৩	৩.০	–	৩	৩	৩.০
নবজাতকের ও প্রসূতির সেবা করার সমস্যা	৪	২	৬	৬.০	১	৪	৫	৫.০
রোগীর পথ্য রান্নার অসুবিধা	–	২	২	২.০	–	১	১	১.০
সাবালক সন্তানদের সঙ্গে একই চালায়/ঘরে শয়ন করার সমস্যা	–	৭	৭	৭.০	–	৪	৪	৪.০
আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে রান্না-বান্নার সমস্যা	২	২	৪	৪.০	২	২	৪	৪.০
প্রায়শ ভেজা কাপড়ে থাকার ফলে অসুখ সৃষ্টি	–	১	১	১.০	–	২	২	২.০
অবসর ও ঘুমের অভাব	৫	১	৬	৬.০	১০	–	১০	১০.০
অন্য সময়ের তুলনায় খাটুনী (গৃহস্থালী কাজে) অনেক বেশী	৮	–	৮	৮.০	৮	৪	১২	১২.০
মোট	৪০	৬০	১০০	১০০.০	৪০	৬০	১০০	১০০.০

মহিলা পরিবার-প্রধান ও রোজগারী-মহিলাদের সমস্যা

মহিলা-প্রধান পরিবারের কর্ত্রী উচ্চ বা মধ্যবিত্তের অধিকারী হলে তাঁদের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হয়। বাড়তি সমস্যা হিসেবে বাজার করা, ঝি না পেয়ে নিজে সংসারের সমস্ত কাজ দেখাশুনা করা এবং কৃষি কাজ তদারকী করার সমস্যায় পড়তে হয়। অপরদিকে মহিলা পরিবার-প্রধান যদি প্রকৃত ভূমিহীন বা ভূমিহীন (যাঁদের বসতবাটীসহ অনূর্ধ্ব ৫০ শতাংশ জমি আছে) হন, তাহলে তাঁর সমস্যাবলী আরও প্রকট হয়। যেমন, আপন পেশার কাজ চালানো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কাজ চালু থাকলে কার্যস্থলে গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টকর হয়, অনেকে আপন পেশা চালাতে না পেরে বিকল্প পেশা গ্রহণ করেন, তাতে আয়/মজুরী প্রায় অর্ধেক কমে যায়, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী সন্তানকে অন্যের বাড়ীতে রেখে বা সঙ্গে নিয়ে কার্যস্থলে যেতে হয়, অন্যথায় পানিতে ডুবে যাবার ভয় থাকে, বন্যা বেশী বৃদ্ধি পেলে কোন আয়ই থাকে না। তখন ভিক্ষাবৃত্তি, অনাহার অথবা সর্বশেষ সম্বল বিক্রি করে দিতে হয় এবং চড়া সুদে (মাসিক শতকরা ১০-৩০ টাকা) ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সন্তানের এবং নিজের অসুখে চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন না। কেইস স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে, বন্যাকালে ছেলে ধরা গুজব ও আতঙ্ক অত্যন্ত বেড়ে যাবার ফলে অনেক রোজগারী মহিলা কাজে গমন না করে অনাহারে সন্তান পাহারা দেন। ১৯৯৬ সালের বন্যাকালে রোজগারী মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যাদি সারণী-৬ এ দেখানো হলো।

সারণী ঃ ৬

নমুনা এলকাদ্বয়ে বন্যা ও বন্যা-উত্তরকালে রোজগারী মহিলাদের সংসার পরিচালনার সমস্যা ,১৯৯৬

কাজ না পেলে সংসার চালানোর প্রক্রিয়া	নমুনা এলাকা				সর্বমোট (N=২০০)	শতকরা
	খোকসাবাড়ী (N=১০০)		মিজানপুর (N=১০০)			
	বাঁ-ভি	বাঁ-বা	বাঁ-ভি	বাঁ-বা		
অর্ধাহারে দিন কাটাতো	১৬	১৫	১২	৯	৫২	২৬.০
ধার করতো	৩	১০	৪	৭	২৪	১২.০
সুদের উপর টাকা ঋণ করতো	৪	৮	২	৫	১৯	৯.৫
সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রি করতো	১	৫	৪	১১	২১	১০.৫
গ্রামের ধনীদের নিকট থেকে সাহায্য নিতো	১	২	–	–	৩	১.৫
সরকারী ভিজিডি কার্ডের গম দ্বারা চলতো	১০	১১	৮	৯	৩৮	১৯.০
শাড়ী/গহনা/কাঁথা বিক্রি করতো	–	২	৪	৩	৯	৪.৫
আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে চেয়ে আনতো	১	২	২	৮	১৩	৬.৫
ভিক্ষা করতো	৪	৫	৪	৮	২১	১০.৫
মোট	৪০	৬০	৪০	৬০	২০০	১০০.০

বন্যা ও শিশুদের বিপন্নতা

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন

০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও বিপন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন শিক্ষারত শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনাগমন কষ্টকর হয়ে যায়। তারা পানি ও কাদার মধ্য দিয়ে দূরের বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৬ সালের বন্যাকালে শতকরা ২৬ ভাগ শিশু বিদ্যালয় গমনে সক্ষম হয়নি। তথ্য মতে গড়ে ১৩ দিন পর্যন্ত এরূপ বিদ্যালয় গমন বন্ধ ছিল। অনেক শিশুর সর্বোচ্চ ২ মাস বিদ্যালয় গমন বন্ধ থাকে। ফলে ড্রপ আউট সৃষ্টি হয় (সারণী-৭)।

সারণী ঃ ৭

শিক্ষারত শিশুদের বন্যাকালে বিদ্যালয়ে গমনাগমন, ১৯৯৬

বন্যাকালে বিদ্যালয়ে গমনাগমন	নমুনা এলাকা							
	খোকসাবাড়ী			মিজানপুর			সর্বমোট	শতকরা
	বাঁ-ভি (N=৫৭)	বাঁ-বা (N=৬৩)	মোট (N=১২০)	বাঁ-ভি (N=৫৮)	বাঁ-বা (N=৭১)	মোট (N=১২৯)	(N=২৪৯)	
গমন করতে পারে	৫১	৪২	৯৩	৫২	৪০	৯২	১৮৫	৭৪.৩০
গমন করতে পারে না	৬	২১	২৭	৬	৩১	৩৭	৬৪	২৫.৭০
মোট	৫৭	৬৩	১২০	৫৮	৭১	১২৯	২৪৯	১০০.০০

শিশুদের চিত্তবিনোদন

শিশুগণ সাঁতার ও নৌকায় চড়া ছাড়া আর কোন খেলাধুলা বা চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পায় না। অবশ্য কেউ কেউ রেডিও শোনার সুযোগ পায়। অনেকে অলসভাবে আড্ডা দেয়ার ফলে 'কিশোর অপরাধী'তে পরিণত হয়। সবচেয়ে সমস্যা ও কষ্টের বিষয় হচ্ছে জলবন্দী ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় থাকার ফলে তাদের শারীরিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেইস স্টাডি থেকে দেখা যায় যে, শিশুদের মাঝে এক প্রকার বিষণ্নতা ও মানসিক অবসাদ কাজ করে। এই বয়সী শিশুদের অনেককে নৌকা চালানো, মাছ ধরা, গবাদি পশু পালনের মত শারীরিকভাবে কষ্টকর ও শক্তি নিঃশেষ

করার কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অথচ এদের চিত্ত-বিনোদনের পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যায় বেশীর ভাগই।

শিশুশ্রম

খোকসাবাড়ী এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে বন্যাকালে পিতা বা বড় ভাইয়ের সঙ্গে সারাদিন নৌকা চালনা করতে হয় এবং বড় বড় গাছের ডালে চড়ে খড়ি সংগ্রহ করতে হয়। মিজানপুর এলাকায় মাছ ধরা বড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইঁদুরের গর্ত থেকে ইঁদুর ধরে আনতে হয়। অনেক সময় ইঁদুরের গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে আসে। তবু এসব বিপজ্জনক কাজ শিশুদেরকেই করতে হয়।

শিশুদের ই. পি. আই. কর্মসূচি

০-২ বছর বয়সী শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের টীকা/ইনজেকশন প্রদানের কাজ বন্যার কারণে ব্যাহত হয়। বন্যাকালে ডিপিটি, পোলিও, বিসিজি, হাম প্রভৃতি টীকা গ্রহণের সময় হলে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। ফলে শিশুদের ইপিআই কর্মসূচির কোর্স পূরণ (সকল ডোজ গ্রহণ) সম্ভব হয়না। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত।

শিশুদের চিকিৎসা সুযোগ

০-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে মা-বাবারা বাড়ীর মধ্যে এমনকি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন যাতে জলে ডুবে মারা না যায়। দীর্ঘদিন এভাবে খেলাধুলাহীন ও আড়ষ্ঠ জীবন কাটানোর ফলে অনেক শিশু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে সময়ে অধিকাংশ পরিবারের তেমন কোন আয় না থাকায় এবং চিকিৎসার সুযোগ সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় শিশুদের অসুখ হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়না। অনেক দরিদ্র শিশু বন্যাকালে আদৌ কোন চিকিৎসা পায়না। বন্যার কারণে বাঁধে বা উঁচু স্থানে আশ্রয় নিলে এসব শিশু সারাদিন রোদে পোড়ে, আবার বৃষ্টি হলে ভেজা কাপড় গায়ে শুকায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের পুরো বন্যাকাল অতিবাহিত হয়। কর্মজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রে এরূপ শিশুকে অন্যের বাসায় রেখে মা কাজে যান। শিশুরা অন্য বাড়ীতে অবহেলা লাভ করে। ফলে তাদের মানসিক সুস্থ বিকাশ ঘটে না। শারীরিক অসুখ তীব্রতর হলে প্রাইভেট ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। এই চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে বহু পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা

বন্যাকালে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতার বর্ণনা ও মাত্রা থকে অনুমিত হয় যে, এদেশের অনগ্রসর ও অবহেলিত এই দু'টি শ্রেণী সত্যিকার অর্থে বন্যাকালে অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ ত্রাণ ও পুনর্বাসন সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিশুর কোন কোটা নেই, মহিলারা পেছনের সারিতে। অপরদিকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে পিতা তাঁর সন্তান-কে অভুক্ত রেখে খেতে পারলেও মা তা পারেন না। তাই রোজগারী মহিলাবৃন্দ

বন্যাকালে যখন পেশা পরিবর্তন করে পেটে-ভাতে ঝি-গিরি করেন, তখনও নিজে না খেয়ে নিজের খাবারটুকু নিয়ে এসে সন্তানের সঙ্গে ভাগ করে অর্ধাহারে থাকেন।

কেইস ষ্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

খোকসাবাড়ী ইউনিয়ন (সিরাজগঞ্জ) ও মিজানপুর ইউনিয়ন (রাজবাড়ী) থেকে গৃহীত ১০ জন মহিলার কেইস স্টাডি থেকে যথার্থভাবে অনুভূত হয় বন্যা পীড়িত এলাকার মহিলা পরিবার-প্রধানদের প্রকৃত অবস্থা। কেইস স্টাডিগুলো থেকে সমীক্ষা এলাকায় দু'টি বিষয় অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, বাঁধের বাইরের অংশে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদের বসবাস। তাঁদের বিত্ত বৈভব থাকলে সম্ভবত তাঁরা বাঁধের ভিতরের অংশে চলে এসে বসতি স্থাপন করতেন অথবা অন্যত্র বন্যাহীন এলাকায় চলে যেতেন। কারণ, পুরো বন্যাকাল এক অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটে তাঁদের দিন। যাঁদের শিশু সন্তান (০-১৪ বছর বয়সী) আছে, তাঁদের অবস্থা আরও বেশী দুঃসহ। সন্তান রেখে কাজে যাওয়া কঠিন, যদি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়, এই ভয়ে। আবার কাজে না গেলে নিজের আহার, সন্তানের দু'মুঠো ভাত জোটানো যায় না। অপরদিকে বাঁধের ভিতরের অংশের মহিলা পরিবার-প্রধানগণ তুলনামূলকভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাঁদেরও বন্যাকালে সমস্যা হয়, কিন্তু সে সমস্যা বেঁচে থাকার বা ক্ষুধার অন্ন জোগাবার জন্য নয়, নিরাপত্তাজনিত অথবা দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়া বা ঝি-চাকর না পাবার সমস্যা। তাই সমস্যাটি বাঁধের বাইরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বাঁধের ভিতরে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দের অভাব।

যেমন দেখা যায়, বিধবা সালেহা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এসে মেয়েদেরকে গার্মেন্টসে চাকরি করতে দিয়েও টিকে থাকতে পারেননি। ফিরে যেতে হয়েছে প্রতি বছর বন্যাক্রান্ত খোকসাবাড়ীর সেই তালগাছ পাঁচিল এলাকায়। তাঁর দুই মেয়ে ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী (অবিবাহিতা) যদিও শিশু নন, তবু বন্যাকালে তাঁরাই বেশী বিপন্ন। ঘরে কাজ নেই, খাবার নেই, বাঁধে আশ্রয় নিতে নিরাপত্তার অভাব। এ এক দুঃসহ জীবন। আবার মিজানপুরের বড়লক্ষিপুর গ্রামের সুন্দরী বিত্তবান ২৭ বছর বয়সী বিধবা আনোয়ারা বেওয়াও বিপন্ন। বন্যাকালে বাড়ীতে চুরির ভয়, নিজের সৌন্দর্য এবং অল্প বয়সে বৈধব্য তাঁকে আরও বেশী বিপন্ন করে তুলেছে। ছেলে ধরা আতঙ্ক বাড়ে বন্যাকালে। প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত জীবন এক অসহনীয় জীবন।

প্রতিবছর যমুনা ও গঙ্গা নদীতে বন্যা আসে। প্রবল বন্যা না হলেও নদী তীরের মহিলা পরিবার প্রধানদের কাজ থাকে না, মজুরী কমে যায়, প্রধান পেশ পরিবর্তন করে অপ্রধান পেশা গ্রহণ করে মহিলা পরিবার-প্রধানদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাঁদের শিশু সন্তানদের। দু'টিই বিপন্ন শ্রেণী, তবু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কোন ভাবে টিকে আছেন তাঁরা। বর্তমান তাঁদেরকে কিছু দেয়নি। অনাগত ভবিষ্যত যদি একটু সুখ এনে দেয়, তারই প্রত্যাশায় চলছে তাঁদের নিরন্তর লড়াই।

বন্যার ক্ষয় ক্ষতি হ্রাসকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

নমুনা এলাকাদ্বয়ের অধিবাসীগণ বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে যে সমস্ত কৌশল গ্রহণ করেন, তার অধিকাংশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্বল্প মেয়াদী। তারা বাস্তুভিঠা মাটি দিয়ে উচুঁ করেন, বাড়ীর চারদিকে (কেউ কেউ) মাটির ৩/৪ ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেন, পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা কেটে রাখেন। তবে একটি ক্ষেত্রেই কেবল তাঁদের সমষ্টিগত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো, বন্যা কালে নিরাপত্তা বিধানের জন্য দল বেঁধে রাতে গ্রাম পাহারার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মন্তব্য অনুযায়ী সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত, পানি বিশুদ্ধকরণ ওষুধ, হাঁস-মুরগীর টীকা/ইনজেকশান ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সর্বদা প্রাপ্তি নিশ্চিত নয় এবং প্রায়ই বিলম্বে পাওয়া যায়।

উপসংহার

সুপারিশমালা

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও তার ফলে সৃষ্ট বিপন্নতা সংক্রান্ত মাধ্যমিক উৎসের তথ্যাদি থেকে বন্যাকালে মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পর্যালোচনা শেষে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এসব বিষয় নিয়ে সুপারিশ পেশ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ শব্দটি আদৌ প্রয়োগ করা সমীচীন হচ্ছে কিনা। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি, বরঞ্চ এর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং অধিকতর বিপন্ন শ্রেণীসমূহের সক্ষমতা আনয়নের প্রচেষ্টা অনেক বেশী লাভজনক। এটি না করার ফলে বন্যাজনিত বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বিপন্নতা বাংলাদেশে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রয়েছে। এসব পর্যালোচনার আলোকে সমীক্ষালব্ধ এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হলো।

সমীক্ষা এলাকার বন্যাপূর্ব সতর্কতা বা বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্যে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ অধিবাসী সরকারী ও বেসরকারী কোন প্রকার প্রচারণা বা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নন। এ বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে বেশ সফলতা লাভ করেছে। ফলে ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বন্যার ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণীয় হতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে বর্ণিত নমুনা ইউনিয়ন দু'টির বাঁধের বাইরের অংশে দ্বি-তল বিল্ডিং বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও মহিলা কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা প্রয়োজন। এতে

বন্যাকালে বন্যাক্রান্ত পরিবারসমূহ যেমন আশ্রয় লাভ করতে পারবেন, তেমনি চিকিৎসা, সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিঘ্নিত হবে না।

উভয় ইউনিয়ন প্রতি বছরই বন্যাক্রান্ত হয় বলে শিক্ষার হার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এই হার বাঁধের বাইরের এলাকায় খুবই কম। তাই বাঁধের বাইরের অংশে একটি করে বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এগুলো দ্বারা শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

বন্যাপ্রবণ এলকাসমূহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহের গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করে 'বন্যাকালীন ছুটি' চালু করা যেতে পারে। এতে শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না, ড্রপ আউটের হার হ্রাস পাবে এবং বন্যা কালে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে বন্যাক্রান্ত পরিবারসমূহ আশ্রয় লাভের সুযোগ পাবে।

বন্যাক্রান্তদের গৃহীত আশ্রয় স্থলসমূহে সরকারী বা বেসরকারী পাহারা ব্যবস্থা চালু থাকা প্রয়োজন। এর ফলে মহিলা আশ্রয় গ্রহণকারীগণ অধিকতর নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং অনেকেই কষ্টকরভাবে পানি প্লাবিত বাড়ীতে না থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে আগ্রহী ও সম্মত হবেন।

বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যাকালে সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় কুটির শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে কর্মের সংস্থান করা যায়। এতে মহিলা ও শিশুগণ হেয়তর পেশা গ্রহণ ও বন্যাকালীন বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাবেন। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাও এতে লাভবান হতে পারবে। এরূপ কাজের সুযোগ দেয়া হলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মহিলা ও শিশুগণ অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারবেন। এমনকি ঐ পেশা পরবর্তীকালেও বজায় রাখতে পারেন। অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাপূর্ণ কুটির শিল্প নির্বাচন করতে হবে।

বন্যাক্রান্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণে বিলম্ব দূর করতে হবে। এর সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি পরিবীক্ষণ দলও প্রেরণ করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে বন্যা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্বাসন সামগ্রী প্রেরণ ও বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রাণ সামগ্রীর ক্ষেত্রে রান্না না করেই খাওয়া যায়, এরূপ সামগ্রী এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বীজ,সার, কীটনাশক এবং ঘরবাড়ী নির্মাণের সামগ্রী প্রদান করা অধিকতর শ্রেয় বিবেচিত হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকার বিত্তহীন ও দুঃস্থ মহিলা প্রধান পরিবারের তালিকা পূর্ব থেকেই ইউনিয়ন পরিষদকে সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দিতে হবে। বন্যাকালে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে সেসব পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে। কষ্ট ও খরচ করে দূর থেকে এসে ত্রাণ সংগ্রহ মহিলাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

বন্যাকালে ও বন্যার পরে অধিক হারে সরকারী ও বেসরকারী ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে নিতান্ত স্বল্প মূল্যে বন্যাক্রান্তদেরকে তাঁদের শেষ সম্বল বিক্রি করতে না হয় এবং অত্যন্ত চড়া সুদের কারবারী মহাজনদের হাতে থেকে তাঁরা রক্ষা পান।

উভয় নমুনা এলাকা নদী ভাঙ্গন দ্বারা আক্রান্ত এবং ইতোমধ্যে উভয় ইউনিয়নের ১টি করে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আরও ১টি করে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। সরকারে 'ফ্যাপ' (ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রাম) অনুযায়ী আরও নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে 'গ্রোয়েন' নির্মাণ বা অন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। বাঁধের বাইরের অংশে 'ম্যানগ্রোভ' জাতীয় বৃক্ষের চারা সরবরাহ করতে হবে। এর ফলে বন্যায় গাছ-পালা মরে যাবে না, নদী ভাঙ্গন রোধ করা যাবে এবং পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।

উপরি-উক্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বন্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বন্যা বিপন্নতা হ্রাসে যে সমস্ত সুপারিশ পাওয়া গেছে, তার আলোকে প্রণীত সুপারিশসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমত, বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি রোধে বাঁধ বা গ্রোয়েন নির্মাণের মত ব্যয়বহুল স্ট্রাকচারাল পন্থা গ্রহণ না করে নন-স্ট্রাকচারাল কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে Khan (1981) এর কিছু নন-স্ট্রাকচারাল পদ্ধতির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের মন থেকে বন্যা ভীতি দুরীকরণ ও কতিপয় বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হলো, বন্যাপূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বন্যাকালে যথাশীঘ্র ত্রাণ সামগ্রী এবং বন্যার অব্যবহিত পরে পুনর্বাসন সামগ্রী প্রেরণ, বন্যাকালে দ্রুত উদ্ধারকার্য পরিচালনা, প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে ত্রাণ-মজুদ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নমুনা এলাকার জনপ্রতিনিধিবৃন্দের মতে বন্যাপ্রবণ এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংক ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের অফিস নির্মাণ এবং বন্যা ও বন্যার অব্যবহিত পরে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কর্মসূচি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সামগ্রী প্রদানে ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। এতে চড়া সুদে ঋণগ্রস্ততা ও বিপন্নতার মাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকারী বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের শাখা অফিস থানা পর্যায়ে রয়েছে, যারা পৃথক পৃথকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা অফিস, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের শাখা অফিস (থানা পর্যায়ে) সমূহের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানমূলক কাজের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। এসব দপ্তরসমূহের মধ্যে

সমন্বয় ঘটিয়ে সমন্বিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস এবং মহিলাসহ দুঃস্থ জনগণের সংঘটিত ক্ষতি পুষিয়ে নেবার ক্ষেত্রে কাজ করার কৌশল নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চতুর্থত, দুঃস্থ মহিলা, রোজগারী মহিলা, দরিদ্র মহিলা পরিবার প্রধান ও শিশুদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহ, বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সুপারিশগুলো দেশের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকবৃন্দ ভেবে দেখতে পারেন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার বিপন্ন মহিলা ও শিশুদের কল্যাণার্থে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

উপসংহার

বাংলাদেশ তার নিজস্ব ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই একটি বন্যাপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর স্বল্প ও তীব্র মাত্রার বন্যা এদেশে আঘাত হানে। বন্যার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে চলেছে। এই নিঃস্বতা কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক, মানসিক ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও বিপন্নতা সৃষ্টি করে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মহিলা ও শিশুগণ এদেশে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ ও অবহেলিত শ্রেণী হিসেবে বিপন্নতার একটা বিশাল অংশ তাঁদের উপর আপতিত হয়।

মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে এখন পর্যন্ত পৃথকভাবে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। ফলে এই দুই গোষ্ঠী, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা ক্ষেত্রে কিছুটা শূন্যতা বিরাজমান। এই গবেষণা কিছুটা হলেও সে ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া, মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে আরও গবেষণা পরিচালিত হতে পারে, যাতে তাঁদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।

সম্প্রতি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারী ও বেসরকারী কতিপয় উদ্যোগ বেশ প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু এখনও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা মুক্ত করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এ কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্রিয়করণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে এই দু'টি শ্রেণীর উন্নয়ন ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সফল করা সম্ভব হবে না।

[লেখক ১৯৯৭ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে এম. ফিল অভিসন্দর্ভ হিসেবে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেন। বর্তমান নিবন্ধটি মূল অভিসন্দর্ভ অনুসরণে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণীত।]

তথ্য নির্দেশিকা

আঞ্চলিক কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড। সিরাজগঞ্জ, ১৯৯৭।

আঞ্চলিক কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড। রাজবাড়ী, ১৯৯৭।

ইউনিসেফ, (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের নারী ও শিশু।* ঢাকা।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। সিরাজগঞ্জ সদর থানা, ১৯৯৭।

থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য। রাজবাড়ী সদর থানা, ১৯৯৭।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, (১৯৯২)। *আদম শুমারী-১৯৯১,* ঢাকা।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, (১৯৮৮)। *টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট-১৯৮৮,* ঢাকা।

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ড, (১৯৯৫)। *বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহের তালিকা,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯৫)। *পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ।* ঢাকা।

মির্জা, এম, মনিরুল কাদের ও পাল, সুব্রত, (১৯৯২)। *প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশের পরিবেশ।* ঢাকা ঃ সেন্টার ফর এনভাইরণমেন্টাল স্ট্যাডিজ এ্যান্ড রিসার্চ।

Alam, S. M. Nurl, (1990). *Annotation of Social Science Literature on Natural Disasters in Bangladesh.* Dhaka : PACT Bangladesh/PRIP.

Elahi, K.M. (1991). *Riverbank Erosion, Flood Hazard and Population Displacement in Bangladesh : An Overview,* In : Elahi, K. M., Ahmed K. S. and Mafizuddin, M. (eds). *Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh.* Dhaka : REIS, J. U.

Islam, A. T. M. Aminul, (1985). *History of Water Resorces Development in Bangladesh.* paper Presented at the Seminar on *'Small Scale Water Development Schemes'.* Dhaka : BWDB.

Khan, Akbar Ali. (1987). *Flood Control Since the Mardel plata Conference 1977 : Selected Economic, Social and Administrative Issues.* Paper presented at the faculty seminar of BPATC, Dhaka.

Siddique, A.B.M. (1989). *Impact of flood on the Economy of Bnagladesh.* in Mohiuddin Ahmed (ed.) *Flood in Bangladesh,* Dhaka.